আল খিলাফাহ্

...কিন্তু আমার পর আর কোনও নবী নেই। শীঘ্রই অনেক সংখ্যক খলিফা আসবেন...

১৭ই রজব, ১৪২৪ হিজরী । ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০০৩

www.khilafat.org

কানকুন সম্মেলন
দাসত্বের শৃংখলে তৃতীয় বিশ্ব

সেপ্টেম্বরে ১০ থেকে ১৪ তারিখ পর্যন্ত মেক্সিকোর কানকুনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা বা WTO এর পঞ্চম মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর তাবত দেশের অর্থনীতিবিদ, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সাংবাদিক ও অন্যান্যরা এ নিয়ে আলোচনার ঝড় বইয়ে দেবেন আগামী কয়েক সপ্তাহ ধরে। বামপন্থী বুদ্ধিজীবিরা WTO এর ভিতরে কি কি খারাপ চুক্তি আছে এবং সেগুলোকে কিভাবে শুধরানো যায় তা নিয়ে বিস্তর 'ইতিবাচক সমালোচনা' বা Positive criticism করবেন। অন্যদিকে মুক্ত বাজার অর্থনীতির বা পুঁজিবাদের ভক্তরা বিশ্বঅর্থনীতির এইরকম একটা খারাপ সময়ে WTO কে শক্তিশালী করা বা বিশ্বায়নকে আরো গতিশীল করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলবেন বলে ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু এত কথার মধ্যেও যে কথাটা কেউ বলছেননা সেটা হলোঃ আমাদের মত দেশগুলির জন্য এই আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য সংস্থাটির কী আদৌ কোন প্রয়োজন আছে? এটি যে পরিমান ক্ষতি গরীব দেশগুলোর করেছে, তারপর এটিকে টিকিয়ে রাখার কি কারণ থাকতে পারে?

অবশ্য আমাদের দেশে যে সকল সরকারী কর্মকর্তা ও অর্থনীতিবিদরা এসব বিষয় নিয়ে কাজ করেন, তারা আর্ন্তজাতিক শোষণের এই প্রতিষ্ঠানটিকে বুঝে বা না বুঝে টিকিয়ে রাখা পক্ষপাতি। ১৯৯৪ সালের এপ্রিল মাসে উরুগুয়ে রাউন্ডে গ্যাস চুক্তি স্বাক্ষর করে এসে বাংলাদেশের তৎকালীন বাণিজ্যমন্ত্রী পরর্বতীতে সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে উনি নিজেই ভালোমত জানতেন না যে স্বাক্ষরিত চুক্তির ফলাফল বাংলাদেশের উপর কি হতে পারে। গত সরকারের আমলে WTO এর মন্ত্রীপর্যায়ের বৈঠকের এক বিশেষ অধিবেশনে আমাদের তৎকালীন বাণিজ্যমন্ত্রী সভাপতির চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এই যখন হচ্ছে আমাদের মানুষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সর্বোচ্চ দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তাদের দায়িত্বের নমুনা তখন WTO এর মতন একটি শোষক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আমাদের নেতৃবৃন্দ যে এই গরীব দেশের মানুষের জন্য কোন ন্যায্য বাণিজ্যিক সুবিধাই আদায় করতে পারবেননা সেটা যত দ্রুত বুঝতে পারা যায় ততই মঙ্গল। এই সাম্রাজ্যবাদী প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসকে একটু ঘাঁটলেই ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে বিশ্বে পুঁজিবাদী শোষণ চাঙ্গা করার লক্ষ্যে বিশ্ব মুরব্বীদের এক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় 'ব্রিটন উড' নামে এক মার্কিন শহরে। এই কনফারেন্সে পুঁজিবাদী মোড়লরা উপনিবেশোত্তর বিশ্বে তাদের অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব বজায় রাখার লক্ষ্যে তিনটি আর্ন্তজাতিক সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এই তিনটি সংস্থা হচ্ছে- ১। বিশ্ব ব্যাংক (World Bank) ২। ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি ফান্ড (IMF) ৩। আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য সংস্থা (International Trade Organization ; ITO)। আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য কখনো দ্বিপাক্ষিক কখনো বহুপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে পরিচালিত হতে হতে সর্বশেষে ১৯৯৫ সালে আর্ন্তজাতিক পুঁজিবাদী বাণিজ্যের চূড়ান্ত ফর্মূলা প্রদানকারী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য সংস্থা বা (WTO)। এভাবেই অন্যের সম্পদ দখলে তৎপর ধনী দেশগুলো নিজেদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বকে নিজেদের স্বার্থে নিয়ে আসে আলোচনার টেবিলে। এখন পর্যন্ত ধনী দেশগুলো আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যের নামে এই WTO কে ব্যবহার করেই স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর বাজার নিজেদের দখলে রেখেছে। আর সেটা করতে গিয়ে তারা তৈরী করেছে

২য় পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ

শ্যারনের ভারত সফরঃ দক্ষিন এশীয় মুসলিমদের জন্য অশনি সংকেত

গত ৮ই সেপ্টেম্বর, সোমবার থেকে দু'দিন ভারত সফর করে গেল অবৈধ ইহুদী রাষ্ট্র ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী অ্যারিয়েল শ্যারন। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাবিহীন বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে যখন বিরুদ্ধ শক্তিগুলো ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠাকে প্রতিহত করার জন্য ক্রমান্বয়ে নিজেদের ঐক্যকে আরো সুসংহত করছে ঠিক সে সময় ইহুদী রাষ্ট্র প্রধান কর্তৃক ভারত সফর বিশ্বে এবং বিশেষত দক্ষিন এশিয়ার মুসলমানদের জন্য নতুন সমস্যার ইঙ্গিত বহন করে।

ভারত ও ইসরায়েল দু'টি দেশই সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছে যে, এই সফরের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজেদের মধ্যে সামরিক সহযোগীতা ও যুদ্ধাস্ত্র কেনা-বেচা আরো জোরদার করা। যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থননের ফলে ইতিমধ্যেই ইসরায়েল ভারতের কাছে ফ্যালকন এয়ারবোর্ন ওয়ার্নিং এন্ড কন্ট্রোল সিস্টেম বিক্রি

৪র্থ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ

ঢাকা ওয়াশিংটন সাম্প্রতিক চুক্তি

মানুষ হত্যার লাইসেন্স?

সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তা নিয়ে এখন সর্বত্র আলোচনা সমালোচনার ঝড় বইছে। যদিও চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি (১৮ই আগষ্ট) কিন্তু দেশবাসী তা জানতে পেরেছে তার প্রায় তিন সপ্তাহ পর। তা-ও সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে এসম্পর্কে কিছুই জানায়নি। বিভিন্ন বেসরকারী সূত্রের মাধ্যমেই তা জানা গেছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্প্রতি এধরণের চুক্তিকে অতি স্বাভাবিক বিষয় বলে আখ্যায়িত করে এই চুক্তি সম্পর্কে সমালোচনা করায় বুদ্ধিজীবিদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে এবং পরে সরকার এ বিষয়ে কঠোর গোপনীয়তা অবলম্বন করেছে এবং দেশবাসীকে সম্পূর্ণ অগোচরে রেখে এধরণের একটি স্পর্শকাতর চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। যদিও সরকার চুক্তিটি এখনো জনসমক্ষে প্রকাশ করেনি তারপরও বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে (এবং সরকারও তা অস্বীকার করেনি) গত মাসের মাঝামাঝি নাগাদ পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় অত্যন্ত গোপনে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দু দেশের অভিযুক্ত সেনা সদস্য হস্তান্তর সংক্রান্ত চুক্তিটি স্বাক্ষর করে। রোম স্ট্যাটিউট চুক্তির ৯৮ নম্বর অনুচ্ছেদের আওতায় যুক্তরাষ্ট্র এ চুক্তি স্বাক্ষর করে।

এ চুক্তির ফলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বাহিনীর এক বা একাধিক সদস্য তথা অফিসার বা সৈনিক বাংলাদেশে কোনো ধরণের

৩য় পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ

দাসত্বের শৃংখলে তৃতীয় বিশ্ব

১ম পৃষ্ঠার পর

বাণিজ্য চুক্তির নামে কিছু অর্থনৈতিক গণবিধ্বংসী অস্ত্র। এই অস্ত্র সমূহের মধ্যে রয়েছে কৃষি চুক্তি (Agreement on agriculture), টেক্সটাইল ও বস্ত্র চুক্তি, রুলস অব অরিজিন চুক্তি, বুদ্ধিজাতক সম্পত্তি সংক্রান্ত চুক্তি (TRIPS) সহ অন্যান্য আরো কিছু চুক্তি।

এই সকল চুক্তি যখন আমাদের মত দেশের সাথে স্বাক্ষরিত হয়েছে, তখন ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, বিশ্ব বাণিজ্যের এই দৌড়ের প্রতিযোগীতায় গরীব রাষ্ট্রগুলিকে ধনীদের সাথে সমানভাবে পাল্লা দিয়ে দৌড়াতে হবে। কয়েক শত বছর ধরে ঔপনিবেশিক শাসনের দ্বারা সম্পদ লুণ্ঠন করে গরীব রাষ্ট্রগুলোকে অর্থনৈতিক ভাবে পঙ্গু অবস্থায় নামকাওয়াস্তে স্বাধীনতা দিয়ে এখন বলা হলো যে তোমরা দুর্বল হও আর খোঁড়া হও তাতে কি, মুক্ত বাজার অর্থনীতির এই যুগে সবাইকে সমান (?) ভাবে শক্তিমানদের সাথে প্রতিযোগীতা করতে হবে। প্রতিযোগীতায় টিকতে পারলে ভাল কথা, না পারলে তোমাদের বেঁচে থাকার অধিকারই থাকবেনা। আর এটাই তো পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী অর্থনীতির মূল কথা। ব্যাপারটা উদাহরণ দিয়ে পরিষ্কার করা যাক। WTO এর কৃষি চুক্তির আওতায় বলা হলো কৃষিতে ভর্তুকির পরিমান কমিয়ে আনার জন্য কিন্তু উন্নত দেশগুলো এটা আদৌ মেনে চলেনি। অন্যদিকে WTO, বিশ্বব্যাংক ও আই এম এফ একত্রে প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করে চলেছে বাংলাদেশের মত দেশগুলোর উপর তাদের কৃষির উপর ভর্তুকি কমিয়ে আনার জন্য যাতে করে গরীব দেশগুলির কৃষি ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে এই দেশগুলো পুরোপুরি ধনী দেশগুলির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, ধনী দেশগুলোর কৃষি ভর্তুকি একদিকে গরীব দেশগুলোর কৃষক ও কৃষি বাজারের ক্ষতি করছে অন্যদিকে কৃষি বাণিজ্যে নিয়োজিত ধনী দেশের কোম্পানীগুলোকে লাভবান করছে। আঙ্কটাডের এক রিপোর্টে দেখা যায় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় জোট আর জাপান মিলে বছরে ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি কৃষিতে প্রদান করে। অথচ বিশ্বব্যাংক অনবরত চাপ দিতে থাকে বাংলাদেশকে ভর্তুকি কমানোসহ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (BADC) এর মত প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য যাতে করে আমাদের বেঁচে থাকার মৌলিক উপাদান খাদ্যটাও তাদের দয়ার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এসব অপতৎপরতার ফলাফল আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি সারা বিশ্বজুড়ে। এই সব কুফরী চুক্তির কারণে সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশে আজ নীরব দুর্ভিক্ষের কারণে লক্ষ লক্ষ নারী, পুরুষ, শিশু অনাহারে ও অপুষ্টিতে মারা যাচ্ছে। সারা পৃথিবীতে ক্ষুধার্ত পেটে ঘুমাতে যাওয়া দরিদ্র মানুষের সংখ্যা প্রতিনিয়তই বাড়ছে। আর এর পরও আমাদের মত দেশের শাসকগোষ্ঠী এই ধরণের চুক্তির উপর আরো আলোচনার জন্য কানকুনে যাচ্ছেন একথা ভাবতেও অবাক লাগে।

এর পর আসা যাক বুদ্ধিজাত সম্পত্তি সংক্রান্ত চুক্তির (Trade Related Intellectual Property Rights- TRIPS) কথায়। এতবড় জুলুমের চুক্তি মানবজাতির ইতিহাসে আর কখনো হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। এই চুক্তির মোদ্দা কথা হলো কোম্পানীগুলোর বাণিজ্যিক স্বার্থে আল্লাহ সৃষ্ট যে কোন 'জীবের' উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করা যাবে। যেমনঃ গাছপালার উপর মালিকানা ব্যবস্থা চালু করা, অনুজীব যেমন ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদির প্যাটেন্ট বা মালিকানা স্বত্ত্ব প্রনয়ণ। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে এরকম একটি ভয়াবহ চুক্তিতে আমরা ইতিমধ্যেই আবদ্ধ হয়ে গেছি।

WTO এর এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করার ফলে আমাদের দেশের নিমগাছের মালিকানা পরোক্ষভাবে চলে গেছে এক মার্কিন কোম্পানীর হাতে। কেননা প্যাটেন্ট করার পর একটি জিনিষের উপর প্যাটেন্টকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের একচ্ছত্র মালিকানা স্বীকার করে নেয়া হয় এবং প্যাটেন্ট আইনকে স্বীকৃতি দানকারী দেশসমুহের সীমানার মধ্যে ঐ জিনিষ যেখানেই থাকুক না কেন তার অধিকার লাভ করে প্যাটেন্টকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান। ভবিষতে শুধু নিমগাছ নয় আমাদের বিভিন্ন প্রজাতির ঔষুধি গাছ ও ফলের বীজ পাশ্চাত্যের কোম্পানীরা প্যাটেন্ট করে নিয়ে আমাদেরকে উৎপাদনের অধিকার ও সামর্থ্যকে তাদের হাতে জিম্মি করে ফেলবে। ভেবে দেখুন, আল্লাহর সৃষ্টি গাছপালা ও অনুজীবসমুহের উপরও এখন কোন কোম্পানী তাদের মালিকানা ঘোষনা করতে পারবে। আর পাশ্চাত্যের এই নব্য নমরুদ আর ফেরাউনরা এই চুক্তির বলে এখন ঘোষনা করেছে যে ২০05 সালের পর অনেক জীবনরক্ষাকারী জরুরী ঔষধও গুটিকয়েক বড় কোম্পানী ছাড়া অন্যান্য দেশ বা কোম্পানী উৎপাদন করতে পারবেনা। আর এই সব ঔষুধের মূল্যও তখন হবে গরীব মানুষের নাগালের বাইরে। তাতে যদি এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিন আমেরিকার অর্ধেক মানুষও এইডস, ম্যালেরিয়া বা যক্ষা রোগে মারা যায় তবে WTO এর কিছু আসবে যাবে না । মানুষের বেঁচে থাকা ও মরে যাওয়া পাশ্চাত্যের শাসকগোষ্ঠীর কাছে কোন বড় বিষয় নয়। তাদের একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হলো মুনাফা। আর এর প্রমান তো এই কিছুদিন আগেই আমরা দেখেছি। পুরো ৯০ এর দশক জুড়ে ইরাকে যখন কয়েক লক্ষ শিশু জাতিসংঘের অবরোধের কারণে ঔষধের অভাবে ও অপুষ্টিতে মৃত্যু বরণ করেছে তখন আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কেউ এর মৃদু প্রতিবাদও করেনি। বিশ্বব্যাংক, আই, এম, এফ, জাতিসংঘ বা WTO- যার কথাই বলিনা কেন, মুখে এরা যতই মানবধিকার আর দারিদ্র কমানোর কথা বলুক না কেন মূলত এরা নিপীড়িত ও শোষিত মানুষকে মেরে সম্পদের দাবিদারের সংখ্যাই কমাতে চায়। এজন্য মানুষের মৃত্যুও এদেরকে তাড়িত করেনা। আল্লাহ সৃষ্ট জীবের উপর মালিকানা ঘোষনা করতে এবং সেই সাথে অন্য সবাইকে একমত হতে বাধ্য করাতে এদের এতটুকু বাধেনা।

এতো গেলো মোটে দুটো চুক্তির কথা। WTO এর সবগুলি চুক্তির মধ্যেই রয়েছে এমন অসংখ্য ধারা ও উপধারা যা পৃথিবীতে অর্থনৈতিক শোষণের মাত্রাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাবে। কানকুনের এই মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে অতীতের ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে। ঘুষ দেয়া, চোখ রাঙ্গানি, হুমকি, ধমক, অপমান, ব্যক্তিগত আক্রমন ইত্যাদির মাধ্যমে গরীব দেশের প্রতিনিধিদের নিষ্ক্রিয় করা এবং ফ্যাসিবাদী প্রক্রিয়ার এক অশ্লীল ও অসম রণক্ষেত্র হলো বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন। সম্মেলনের একপর্যায়ে সাধারণ আলোচনা স্থানের বাইরে ডিরেক্টর জেনারেলের উদ্যোগে শুরু হয় গ্রীনরুম সমঝোতা পর্ব। মূলতঃ এখানেই চূড়ান্ত হয় দরিদ্র দেশগুলোর সাধারণ মানুষকে শোষণের নীল নকশা। বাংলাদেশের হাজার হাজার শ্রমিক কাজ পাবে না বেকার হবে কিংবা এদেশের কি পরিমান পানি, গ্যাস বা অন্যান্য সম্পদ বিদেশী কর্পোরেশন লুটে নেবে তাঁর সিদ্ধান্ত পাকা করা হয় গুটি কয়েক ধনী দেশের প্রেসক্রিপশনের ভিত্তিতে।

তাহলে কিছুদিন পরপর এসব সম্মেলনে গরীব দেশগুলোকে কেন ডাকা হয়? আর আমরা সেখান থেকে কি পাই? বস্তুতঃ এসব সংস্থা আর সম্মেলনে গরীব দেশগুলো ধনীদেশগুলোর ষড়যন্ত্রের কাছে পরাজিত হয়ে নতুন নতুন শোষণের শৃংখলে জড়িয়ে পড়ে মাত্র। গরীব দেশগুলোর সস্তা ভোট অনেক সময়ই সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে বৈধতা দানের সিল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গরীব দেশগুলোর প্রতিনিধি হয়ে যাওয়া ছোট-বড় পুঁজিপতি আর অতিশিক্ষিত আমলারা সম্মেলনে পান বড় বড় পদ, কলসালটেন্সির অফার, অনেক লম্বা লম্বা প্রশংসাসূচক বাক্য আর এসবের বিনিময়ে স্বাক্ষর করেন গোলামীর দাসখত।

এখন প্রশ্ন জাগে এই সীমাহীন জুলুম আর শোষন নির্যাতন কি একেবারেই অপ্রতিরোধ্য? এভাবেই কি গুটি কয়েক কর্পোরেট মালিক লুণ্ঠন করবে সমস্ত পৃথিবীর মানুষের মুখের গ্রাস? এর কি কোন সমাধান নেই?

বস্তুতঃ এই ভয়াবহ দুর্যোগের একটাই সমাধান আর তা হলো মানুষের তীব্র ভোগলিপ্সা আর খেয়ালখুশীর উপর প্রতিষ্ঠিত এই পুঁজিবাদী সভ্যতার পতন ঘটানো আর তার স্থলে আল্লাহসুবহানাহুওয়াতা'আলা প্রদত্ত শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা তথা ইসলামী রাষ্ট্র খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। আজ পৃথিবীর বিভিন্ন ধনী দেশের পুঁজিবাদী শাসকগোষ্ঠী তাদের রাষ্ট্রযন্ত্রকে সারা বিশ্বের সম্পদ লুণ্ঠনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে আর শোষিত রাষ্ট্রগুলো বিশেষ করে মুসলিম বিশ্ব পুঁজিবাদকে অবলম্বন করেই তাদের শোষনের মুখে কোন রকমে টিকে থাকতে চাচ্ছে- ফলশ্রুতিতে তারা পুঁজিবাদীদের আরো সহজ শিকারে পরিণত হচ্ছে। খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হলে তা শোষিত মানুষের পক্ষে লুটেরা জাতিগুলোর মুখোমুখি দাঁড়াবে। প্রতিষ্ঠিত করবে ন্যায্য বাণিজ্যের অধিকার ও নিয়মনীতি। খিলাফত কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থে নয় বরং আল্লাহসুবহানাহুওয়াতা'আলা সমগ্র মানবজাতিকে যে অধিকার দিয়েছেন তা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করবে। খিলাফতের অধীনে রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ শুধু মাত্র ইসলামী শরীয়াহ্‌র সীমার মধ্যেই বিভিন্ন চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারবেন, ফলে সমগ্র মানবতার স্বার্থ অল্প কিছু মানুষের স্বার্থ আর খেয়ালখুশীর হাতে জিম্মি হয়ে পড়বে না।

আজকের পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও কর্পোরেটগুলো যেভাবে পৃথিবীর ভূমি ও সম্পদের অধিকার নিজেদের হাতে কুক্ষিগত করে ফেলেছে ইসলাম তা থেকে মানুষকে মুক্ত করবে। কেননা আল্লাহ সুবহানাহুওয়াতা'আলা বলেন

"তিনি (আল্লাহ) তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম করেছেন, তোমরা এর বুকে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিযিক আহার কর" [মূলক - ১৫]

ইসলাম কোন সম্পদের উপর কোন মানুষের চূড়ান্ত অধিকার স্বীকার করে না। আল্লাহ সুবহানাহুওয়াতা'আলা পবিত্র কোরআনে বলেন-

"আসমান-জমিন, এদু'য়ের মধ্যবর্তী স্থানে এবং মাটির তলদেশে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর (আল্লাহর)" [তোয়াহা - ৬]

ইসলামে নেই একচেটিয়া ও সর্বগ্রাসী ব্যক্তিমালিকানার অধিকার। ইসলামে ব্যক্তি মালিকানার উপযুক্ত সম্পদ, জনগণের সম্পদ ও রাষ্ট্রের (সরকারের) সম্পদ সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত। ইসলাম নিষিদ্ধ করে সুদ, ঘুষ, প্রতারণা ও মজুতদারী।প্যাটেন্ট, কপিরাইট বা সম্পদ/ পণ্যের উপর বুদ্ধিজাত কোন অধিকার ইসলাম স্বীকার করে না। ইসলাম নিশ্চিত করে কৃষি জমির উপর প্রকৃত কৃষকের অধিকার।

এভাবে ইসলামী রাষ্ট্র খিলাফত কুফর পুঁজিবাদী আগ্রাসন থেকে নিজের জনগণকে রক্ষা করে এবং সেই সাথে পৃথিবীর বাকী অংশের বিপন্ন মানবতার জন্য আশ্রয়স্থল হিসাবে কাজ করে। অতএব আমাদের উচিত এখনই কাজ শুরু করা যাতে পৃথিবীতে মানুষের তৈরী জালিম ব্যবস্থার পরিবর্তে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়।

-শেখ তৌফিক, সদস্য, হিযবুত তাহ্‌রীর বাংলাদেশ

মানুষ হত্যার লাইসেন্স?

১ম পৃষ্ঠার পর

অপরাধের জন্য অভিযুক্ত হলে অথবা অন্য কোনো দেশে অপরাধ করে বাংলাদেশে আশ্রয় নিলে তাকে বা তাদেরকে বাংলাদেশের আইনে বাংলাদেশে বিচার করা যাবে না অথবা আন্তজার্তিক ক্রিমিনাল কোর্টে পাঠানো যাবে না। তাদেরকে অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করতে হবে।

চুক্তি অনুসারে বিভিন্ন দেশে শান্তিরক্ষী বাহিনীতে কর্মরত বাংলাদেশী সেনা সদস্যরা কোনো অপরাধের জন্য অভিযুক্ত হলে তাদেরকে বাংলাদেশ সরকারের কাছে হস্তান্তরের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র সহায়তা করবে।

এর আগে বিগত সরকারের আমলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে সামরিক সহযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে যে 'সোফা' (স্ট্যাটাস অব ফোর্সেস এগ্রিমেন্ট) চুক্তি স্বাক্ষরের উদ্যোগ নিয়েছিল তাতে বর্তমান চুক্তির বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ায় 'সোফা' নিয়ে তৎকালীন সরকার আর এগোয়নি। এছাড়া 'সোফা'য় মার্কিন সামরিক বাহিনীর সদস্যদের পাসপোর্ট- ভিসা ছাড়াই তাদের নিজস্ব পরিচয়পত্র নিয়ে একক বা গ্রুপ হিসেবে বাংলাদেশে আসা যাওয়া এবং শুল্ক ও পরীক্ষা ছাড়া সরঞ্জামাদি আনা-নেওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছিল।

বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের খবর অনুযায়ী জানা যায়, গত জুন মাসে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল এক ঝটিকা সফরে ঢাকায় এসে ইরাকে সেনা পাঠানোর প্রস্তাবের পাশাপাশি অভিযুক্ত সেনা হস্তান্তর সংক্রান্ত চুক্তি (রোম স্ট্যাটিউট চুক্তির ৯৮ নম্বর অনুচ্ছেদের আওতায়) স্বাক্ষরের অনুরোধ জানান। তার পর থেকেই যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশ চুক্তি স্বাক্ষর করতে দেরি করার এক পর্যায়ে বাংলাদেশকে সব ধরণের বাণিজ্য এবং সাহায্য বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। ফলে বাংলাদেশ সরকার অনেকটা বাধ্য হয়েই চুক্তিটি স্বাক্ষর করতে সম্মত হয়।

বস্তুতঃ যে মার্কিনবাহিনী এখন সারাবিশ্বের বিভিন্ন অংশে বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে নির্বিচার হত্যা-দখল-ধর্ষন-লুটপাট-ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে বাংলাদেশ কর্তৃক এধরণের আইনী ছাড়পত্র দেয়ার সহজ অর্থ হচ্ছে তাদের হাতে বাংলাদেশের নাগরিকদের হত্যা, জখম আর ধর্ষনের লাইসেন্স প্রদান করা। এই চুক্তির ফলে বিশ্বে ইতিমধ্যেই নিষ্ঠুরতার জন্য কুখ্যাত হয়ে ওঠা মার্কিনবাহিনীর বাংলাদেশে অবস্থান কালে তার উপর বাংলাদেশের কোন নিয়ন্ত্রনই থাকবে না। তারা এখানে এসে যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে। এই চুক্তি করার পূর্বে আমরা কি চিন্তা করেছি কাদের সাথে এই চুক্তি করা হচ্ছে, কাদেরকে আমরা সহযোগিতা করছি? আর মার্কিনীরাই বা কেন হঠাৎ করে জোর জবরদস্তি করে বাংলাদেশের কাছ থেকে এধরণের নিরাপত্তা আদায় করল? এটা তাদের বাংলাদেশে ঘাঁটি গাড়ার পূর্ব লক্ষণ নয়তো?

সরকার যেভাবে জনগণের অগোচরে এ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে তাতে দেশ চলমান শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কেও জনগণের চোখ খুলে গেছে। যদিও দেশে বছরের পর বছর ধরে গণতন্ত্রের কথা বলা হচ্ছে- বলা হচ্ছে সরকারের কাজ হচ্ছে জনগণের ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করা- কিন্তু বাস্তবে কি হয়? বাস্তবে জনগণকে বিভিন্ন উন্নয়নের লোভ দেখিয়ে প্রতি পাঁচ বছর পর পর একদল স্বার্থান্বেষী কালো টাকার মালিক আইন প্রণয়ন ও দেশ শাসনের ক্ষমতা লাভ করে এবং ক্ষমতায় যাবার পর নিজেদের স্বার্থকে সংরক্ষন করার সব রকম ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে। যেহেতু শাসন ব্যবস্থা কোন সুনির্দিষ্ট ও স্থায়ী নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত নয় সেহেতু তারা যা ইচ্ছা তাই করার অধিকার পেয়ে যায় এবং গুটিকতক ব্যক্তির স্বার্থ উদ্ধারের জন্য যতরকম আইন, চুক্তি, নীতি দরকার সবই নির্দ্বিধায় করতে সক্ষম হয়। পাঁচ বছর পর এই গোষ্ঠীর কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে জনগণ একই চিন্তা ধারার অপর একটি গোষ্ঠীকে সেই আগের কাঠামোর শাসন ব্যবস্থায় সর্বময় ক্ষমতা দিয়ে পাঠায় এবং তারাও যথারীতি নিজের মত করে আইন ও চুক্তি স্বাক্ষর করতে শুরু করে। এই ব্যবস্থায় জনগণের ইচ্ছা, অধিকার, ক্ষমতা, সবই শেষ পর্যন্ত কল্পনার ফানুস হিসেবেই থেকে যায়। কিন্তু আজ যদি জাতি হিসাবে আমরা কোন সত্য ও ন্যায় ভিত্তিক অপরিবর্তনীয় নীতি অনুসরণ করতাম তাহলে আমাদেরকে এধরণের অপমানকর অন্যায় চুক্তি ও আইনের বেড়াজালে কখনো আটকে পড়তে হতো না।

এই চুক্তি স্বাক্ষর প্রসঙ্গে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে, অনেক দেশ ইতিমধ্যেই মার্কিনীদের সাথে এধরণের চুক্তি করেছে এবং পাশাপাশি আকার ইঙ্গিতে এমন একটা ধারণা দেয়া হয়েছে যে বাংলাদেশের মত দেশগুলো আসলে এধরণের চুক্তি করতে বাধ্য। বস্তুতঃ বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জাতীয় ধারণার যে কোন ভিত্তি নেই তাও নয়। যদিও জনসংখ্যার দিক দিয়ে আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ দশটি দেশের অন্তর্ভূক্ত তার পরও জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার মত কোন আদর্শের (Ideology) অভাব পুরো জাতিকে হতাশ, বিভক্ত ও দুর্বল করে রেখেছে। এর ফলে আমাদের সম্পদ লুটপাট হচ্ছে, আমাদের মান মর্যাদা ধূলায় মিশে যাচ্ছে, আমরা পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলোর বিশেষতঃ মার্কিনীদের আজ্ঞাবহ হিসাবে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছি। এধরণের একটি অধঃপতিত অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে হলে আমাদেরকে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে এবং একটি সত্য ও কার্যকর আদর্শের সন্ধান করতে হবে। যেহেতু মুসলমান হিসাবে আমরা আল্লাহ সুবহানাহুওয়াত-া'আলা এবং ইসলামের বিশ্বাস করি সেহেতু অবশ্যই ইসলামই হবে আমাদের জন্য একমাত্র জীবনাদর্শ। কেননা আল্লাহ সুবহানাহুওয়াতা'আলা বলেন,

" আজ আমি আমার দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম; তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম আর ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম।" [মায়িদা -৩]

আর ইসলামকে জীবনের কোন একটি অংশে (যেমন ব্যক্তিজীবনে) গ্রহন করে বাকী অংশে (সমাজ, রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি) ছেড়ে দেয়ার পরিস্থিতি সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহুওয়াতা'আলা বলেন

" তবে কি তোমরা কিতাবের (কুরআনের) এক অংশকে স্বীকার কর আর অপর অংশকে অস্বীকার (পরিত্যাগ) কর? যারা এরূপ করবে এ পৃথিবীর জীবনে তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর যন্ত্রনাদায়ক আযাব।" [বাকারা - ৮৫]

আজ আমরা দুর্বল ও লাঞ্ছিত কেননা আমরা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামকে ছেড়ে পুঁজিবাদী আদর্শ অনুকরণ করার ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছি। অতএব প্রিয় দেশবাসী, আমরা যদি সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলোর হিংস্র থাবা থেকে নিজেদের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করতে চাই, চাই পৃথিবীতে সম্মান, মর্যাদা আর পরকালে মুক্তি তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই বর্তমানে প্রচলিত মানুষের তৈরী শাসন ব্যবস্থাকে পরিত্যাগ করে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রে বাস্তবায়ন করতে হবে। ইসলামের অধীনেই কেবলমাত্র কোটি কোটি মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ ও উদ্দীপ্ত করা সম্ভব। ইসলামী রাষ্ট্র খিলাফত একটি সুনির্দিষ্ট পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে এবং সেই পররাষ্ট্রনীতির মূল উদ্দেশ্য পৃথিবীতে ইসলামী জীবনাদর্শের বিস্তার ঘটানো। এধরণের একটি বিশাল ও মহান উদ্দেশ্যের পেছনে যখন আমাদের পুরো জাতি ঐক্যবদ্ধ হবে তখন আমরা অবশ্যই আল্লাহ সুবহানাহুওয়াতা'আলার সাহায্য লাভ করবো এবং সর্বাবস্থায় পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার মত সাহস ও শক্তি অর্জন করতে সক্ষম হবো। ইসলামী রাষ্ট্র খিলাফত অন্যায়কে ধামাচাপা দেয়া বা উপেক্ষা করার জন্য কাজ করেনা। অপরাধী যেই হোক এমনকি সে মুসলমানদের খলিফা হলেও তার বিচার করে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করাই ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। রাসূল (সাঃ) বলেন, *"এমনকি আমার মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করত তাহলে আমি তার হাত কেটে দিতাম।"* কোন অন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ইসলামী রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সাথে কোন চুক্তি করার ক্ষমতা রাখেনা। ইসলামী রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি হারাম হালালের সীমারেখা মেনে চলে এবং সমস্ত চুক্তি আল্লাহ প্রদত্ত সীমারেখার মধ্যে হতে হয়। পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বীনকে অন্য সব জীবন ব্যবস্থার উপর সমুন্নত রাখাই ইসলামী রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। তাই খিলাফত রাষ্ট্র কখনোইকোন নতজানু পররাষ্ট্রনীতি গ্রহন করতে পারে না। রাসূল (সাঃ) এর ওফাতের পর যতদিন মুসলমানরা খিলাফতের মাধ্যমে ইসলাম বাস্তবায়ন করেছে ততদিন তারা পৃথিবীতে বিজয়ী জাতি হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। জালিমকে দমন করা আর নির্যাতিতকে আশ্রয় দান করাই খিলাফতের দীর্ঘ সহস্র বছরের ইতিহাস। আজ আমাদেরকে তাই সেই খিলাফত ব্যবস্থার দিকেই ফিরে যেতে হবে। আর এ সত্যটি আমরা জাতি হিসাবে যত দ্রুত উপলব্ধি করব আমাদের বিজয় ততই ত্বরান্বিত হবে।

আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষন না তারা নিজেরা তা করে।
[সূরা-রাদ -১১]

অনিবার্য কারণে মহিউদ্দিন আহমেদের ধারাবাহিক প্রবন্ধ "বাংলাদেশকে গরীব করে রেখেছে কারা" বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হলো না।

-আল খিলাফাহ্ ।

১ম পৃষ্ঠার পর

শ্যারনের ভারত সফরঃ দক্ষিন এশীয় মুসলিমদের জন্য অশনি সংকেত

করেছে। এই সফরে ফ্যালকন রাডার সিস্টেম ক্রয়ের ব্যাপারে ভারত আলোচনা করে এবং বিক্রয়যোগ্য সমরাস্ত্রের একটি তালিকা ইসরায়েলের হাতে তুলে দেয়। উল্লেখ্য, ১৯৯২ সালে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ১১ বছরের মাথায় ইসরায়েল এখন ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম অস্ত্র সরবরাহকারী দেশ।

কাদের বিরুদ্ধে ভারত ও ইসরায়েল পরস্পরকে সামরিকভাবে সুসজ্জিত করছে তা সুস্পষ্ট। জন্মলগ্ন থেকে প্রতিদিন শত শত মুসলিম নিধনকারী এই অবৈধ ইহুদী রাষ্ট্রটির সাথে ভারত প্রকাশ্যে সুসম্পর্ক ও সাহায্য সহযোগীতা বজায় রেখে চলেছে। ইসলাম বিদ্বেষ ও মুসলমানদের স্বার্থ বিনষ্টের ক্ষেত্রে এই দু'টি রাষ্ট্রের আচরণ বরবরই একরকম। ভারত যেমন ফারাক্কা বাধেঁর মাধ্যমে আমাদের মারতে চায় তদ্রুপ ইসরায়েলও তার নেগেভ অঞ্চলে কৃষি কাজের জন্য জর্ডান নদীর পানির গতি পরিবর্তন করে পার্শ্ববর্তী মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে সংকটে নিক্ষেপ করেছে। আজকে যে শ্যারন প্রধানমন্ত্রী রূপে ভারত সফর করছে, ১৯৮২ সালে ইসরায়েলের সমরমন্ত্রী থাকাকালে এই শ্যারনই পশ্চিম বৈরুতে শাতিলা ও সাবরা উদ্বাস্তু শিবিরে হাজার হাজার অসহায় মুসলিম পুরুষ,মহিলা ও শিশুকে নির্বিচারে হত্যা করে যার ফলশ্রুতিতে প্রবল বিশ্ব জনমতের চাপে শ্যারনকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। অনুরূপে সাম্প্রতিক কালে ভারতের গুজরাটে বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর ছত্রছায়ায় শত শত মুসলিম নারী, পুরুষ, শিশুকে একই ভাবে হত্যা করা হয়। ইসরায়েল বছরের পর বছর প্যালেস্টাইনকে দখলে রেখে প্রতিদিন নৃশংসভাবে অসহায় মুসলমানদের হত্যা করছে এবং ভারতও একইভাবে কাশ্মীরে তার দখলদারিত্ব বজায় রেখে হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করছে। ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি হিংস্রতায় ইহুদী ও মুশরিকদের এই সমরূপতা আল কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের বাস্তবতাকেই আমাদের কাছে সুস্পষ্ট করে- যাতে আল্লাহ সুবহানাহুওয়াতা'আলা বলেন,

" মানবমন্ডলীর মধ্যে বিশ্বাসীদের প্রতি শত্রুতায় আপনি ইহুদী ও মুশরিকদেরকেই সবার্ধিক উগ্র পাবেন।"
[সূরা- আল মায়েদা, আয়াতঃ৮২]

" কখনো কখনো তাদের মুখ থেকে বিদ্বেষ প্রকাশ পায়। কিন্তু যা তাদের হৃদয়ে গোপন রাখে তা তো আরো গুরুতর।" [সূরা-আল ইমরান, আয়াত- ১১৮]

দক্ষিন এশিয়ার মধ্যে ভারত এমন একটি শক্তিশালী মুশরিক রাষ্ট্র যা এ অঞ্চলে ইসলামী জীবনব্যবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক। একারণেই যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের ন্যায় সাম্রাজ্যবাদী কুফর রাষ্ট্রগুলো ইহুদীদের পাশাপাশি ভারতকে এ অঞ্চলে ইসলাম প্রতিহত করার ক্ষেত্রে তাদের সবচেয়ে বড় সহায়ক শক্তি হিসেবে জানে। এমনকি মুসলিম ভূমি জবরদখল করে অবৈধ ইহুদী রাষ্ট্র ইসরায়েল প্রতিষ্ঠা এবং একে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যক্ষ মদদের একটি বড় কারণ এই যে, এটি সুয়েজ খালের এক প্রান্তে অবস্থিত যা তিনটি মহাদেশের কেন্দ্রস্থল এবং তাদের বন্ধুরাষ্ট্র ভারতে যাবার নিরাপদ পথ। ৮ই মে ভারতের বিজেপি সরকারের জাতীয় প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রজেস মিশ্রা, ওয়াশিংটনে আমেরিকা- ইহুদী সভায় ভারত, ইসরায়েল ও আমেরিকার মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়ে বর্ণনা করেছেন যে, "ঐক্যবদ্ধ মুক্ত সমাজ যন্ত্রনাদায়ক সন্ত্রাসবাদকে প্রতিহত করার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।" তিনি আরো বলেন যে, "শক্তিশালী আমেরিকা- ভারত সম্পর্ক এবং ভারত-ইসরায়েল সম্পর্ক একটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার।" বাজপেয়ী বলেছেন, "দ্বিপাক্ষিক এবং আর্ন্তজাতিক পরিকল্পনার সাথে তাল মিলিয়ে আমরা বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিশেষ অবদান রাখছি। এটা এমন এক শক্তি যা গণতান্ত্রিক সমাজকে নিশানা করেছে। এটাকে ঠেকানোর জন্য একটা বিশ্বব্যাপী সুসজ্জিত সার্বিক প্রতিরোধের প্রয়োজন।"এই সুসম্পর্কের কারণেই সাম্প্রতিককালে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক দখলকৃত ইরাক পুনর্গঠনে ইহুদী ও ভারতীয়দের প্রাধান্য দান করা হয়।

আসলে ইহুদী ও মুশরিক জাতির সম্মিলিতভাবে ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষ কোন নতুন ঘটনা নয়- বরং এর শুরু ইসলামের আবির্ভাব কাল থেকেই। রাসূল (সাঃ) ও যখন প্রথম ইসলামের আহ্বান জানালেন তখনই ইহুদী ও মুশরেকরা একযোগে তাঁকে ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। রাসূল (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীদের রক্ত ঝরানো ত্যাগ-তিতিক্ষা ও আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত বিজয়ের ফলে মদীনায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রটির সূচনালগ্ন থেকেই মক্কার মূর্তিপূজারী মুশরিক এবং মদিনার মুনাফিক ও ইহুদী গোত্রগুলো রাসূল (সাঃ) এবং এই রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে পুরোপুরি ধ্বংস করার চেষ্টায় সদা তৎপর ছিল। মদীনার সনদে বর্ণিত ধারা অনুযায়ী ইহুদীরা প্রকাশ্যে রাসূল (সাঃ) এর নেতৃত্ব মেনে নিয়ে তাঁর (সাঃ) সাথে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ থাকার ঘোষনা দিলেও গোপনে সর্বদাই তারা মুশরিকদের সাথে মুসলিমদের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। আজ যেমন শ্যারন ও তার ১৫০ সদস্যের ইহুদী প্রতিনিধি দলটি ভারতের মুশ-রিকদের সাথে বৈঠক করে গেল ঠিক তদ্রুপ পঞ্চম হিজরীতে ইহুদী গোত্র বনী নাযীর ও বনী ওয়াইলের হুয়াই ইবনে আখতাব, হাওযা ইবনে কায়েম প্রমুখ ইহুদী সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল মক্কায় গমন করে মুশরিক কুরাইশদের সাথে জোটবদ্ধ হয়, অতঃপর শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করে ইহুদী গোত্র বনী কুরাইযাসহ রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা গ্রহন করে। এই সম্মিলিত ইহুদী-মুশরিক জোটকে প্রতিহত করার জন্যই ইতিহাসখ্যাত পরিখার (খন্দক) যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

বস্তুতঃ ১৯২৪ সালে খিলাফতের পতনের পরপরই ইহুদী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং তার পর প্রায় শতাব্দিকাল ধরে সমগ্র বিশ্বে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে একের পর এক জুলুম, নির্যাতন, আগ্রাসন ও মুসলিম ভূমি দখলের প্রচেষ্টা- এই সবই প্রমান করে যে খিলাফত ব্যবস্থার অনুপস্থিতিই ইহুদী ও মুশরিকদেরকে মুসলিমদের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে এতটা দুঃসাহসী হবার সুযোগ করে দিয়েছে।

আমরা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশের অধিবাসী হয়ে আমাদের চিরশত্রু ইহুদী রাষ্ট্র ইসরায়েল কর্তৃক মূর্তিপূজারী মুশরিক রাষ্ট্র ভারতের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি এবং উভয়ের এই পারস্পরিক আঁতাতকে নিরুদ্বিগ্নভাবে মেনে নিতে পারিনা। অতীতের ঘটনাবলী থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, এ অঞ্চলে এই ইহুদী-মুশরিক জোটের কারণে আমরা মুসলমানরা এখানে অচিরেই অস্তিত্বের সংকটে নিপতিত হব। তারা কোনকালেই আমাদের বন্ধু ছিল না। আমরা তাদের তাঁবেদারী ও দাসত্ব মেনে নিতে অস্বীকার করা মাত্রই তারা স্বরূপে আর্বিভূত হয়ে আমাদের নির্মূল করবে।

আজকে যখন কাফের এবং মূর্তিপূজারীরা এক জোট হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও কূটপরিকল্পনায় ব্যস্ত তখন মুসলিম বিশ্বের করুন বাস্তবতা হচ্ছে যে, আমরা বহুধা বিভক্ত হয়ে আছি এবং শাসিত হচ্ছি ঐ কাফের, মুশরিকদের বসিয়ে যাওয়া দালালদের দ্বারা। এই সকল দুর্নীতি গ্রস্ত শাসকেরা কাফেরদের চক্রান্তকে প্রকাশ করা এবং তা প্রতিহত করার পরিবর্তে তাদেরকেই আমাদের ভুমিদখলের ব্যাপারে সহযোগীতা করছে। তারা স্বেচ্ছায় কাফেরদের আমন্ত্রন জানাচ্ছে এবং আমাদের সম্পদ চুরি করে নেয়ার ব্যাপারে কাফেরদের উদ্দেশ্যে সহযোগীতার হাত বাড়াচ্ছে। এটা হচ্ছে সেই নির্বাচিত শাসক গোষ্ঠী যারা আমাদের জমিনে সাম্রাজ্যবাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সাহায্য করছে।

খ্রিষ্টান-ইহুদী-মুশরিক জোটের বিপরীতে আমরা এই অঞ্চলের মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ না হয়ে বরং নিজেদেরকে বি,এন,পি- আওয়ামী লীগ ইত্যাদি কৃত্রিম নামের আড়ালে বিভক্ত করে রেখেছি। এই অঞ্চলে ইহুদী-মুশরিকদের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রশক্তিকে প্রতিহত করতে হলে আমাদেরকে এসব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে দ্রুত ইসলামী জীবন ব্যবস্থার ভিত্তিতে আরেকটি মজবুত রাষ্ট্রীয় কাঠামো তথা খিলাফত ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহুওয়াতা'আলা আমাদেরকে ইহুদী-মুশরিকদের ষড়যন্ত্র উপলব্ধি করার এবং তাদেরকে প্রতিহত করে এই অঞ্চলে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে খিলাফত ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

"আর তারা তো তাদের ষড়যন্ত্র করছিল এবং আল্লাহ ও তাঁর কৌশল করছিলেন, বস্তুত আল্লাহ হলেন শ্রেষ্ঠ কৌশলী।" [সূরা- আনফাল, আয়াত- ৩০]

সম্পাদকমন্ডলী
ওয়ায়েস মাহবুব, আরিফুর রহমান চৌধুরী, আহমেদ জামাল ইকবাল

খায়রুন্নেসা ম্যানসন (৪র্থ তলা), ২৩৪ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা। **ফোনঃ** ০১৭১ ৬০৩৫৮৪, ০১১ ০১১৪৬৪

www.khilafat.org